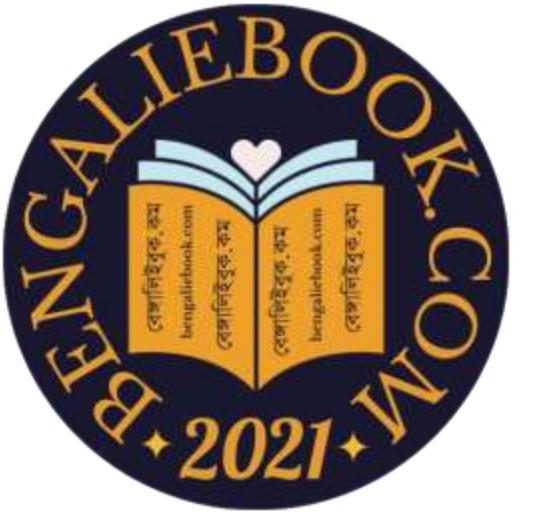


প্রবন্ধ

বাঙ্গালার ইতিহাসের

উন্নয়ন

বঙ্গিমচন্দ্র চত্রিপাধ্যায়



## বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ \*

কামরূপ-রঙপুর

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে-কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেতাদিগের মধ্যে এই ভাস্তির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। “বাঙ্গালার ইতিহাস” ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখ্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভাস্তি; কেন না সেন, পাল ও বখ্তিয়ারের সময় বাঙ্গালা কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখ্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙালী বলিয়া কোন জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙালী হইয়াছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেকগুলি পৃথক্ক রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন না, বাঙালাই তখন ছিল না। সেগুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না—সকলই পৃথক্ক পৃথক্ক স্বস্বপ্রধান। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্যজাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্বত্র প্রায় আর্যপ্রধান; এই আর্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, যাহারা আর্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আর্যদিগের ধর্ম গ্রহণ করিল। আগে একধর্ম, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছাধীন হইয়া আধুনিক বাঙালায় পরিণত হইল।

কিন্তু সেই একচ্ছাধীনত সম্পত্তি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে। বাঙালীর দেশ, মুসলমানেরা কখনই একচ্ছাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আধুনিক বাঙালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই।

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বাঙালার ইতিহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে বা মিলানের ইতিহাস লিখিলে বা নেপল্সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বাঙালারও কতক তেমনি। কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল; বাঙালা বলিয়া দেশ ছিল না। বাঙালার ইতিহাস আরন্ত মোগলের সময় হইতে।

আমরা বাঙালার ঐতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বলিতেছি বা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পূর্ব বাঙালার কথা বলিব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙালাভূক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙালার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

---

\*বঙ্গদর্শন, ১২৮৯, জৈয়ষ্ঠ।

---

যেমন এখন কাহাকে বাঙালা বলি, আগে তাহা বাঙালা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনার্য্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আর্যরাজা ছিল। তাহাকে প্রাগ্জ্যোত্তীষ্ণ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পূর্বাঞ্চলের অনার্য্যভূমিমধ্যে একা আর্য্য জাতির প্রভা বিস্তার করিতে বলিয়া ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্জ্যোত্তীষ্ণের ভগদত্ত, দুর্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙালার অধিবাসী, তাম্রলিঙ্গ, পৌত্র, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙালা যে সময়ে অনার্য্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্য্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা

অঘটনীয় নহে। মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজদিগের এক আড়তা মান্দ্রাজে, আর আড়তা পিল্ললী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্জ্যোত্তীর্যের আর্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বাঙালায় আসিয়া বাঙালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পার আর্যেরা দক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তরপূর্বমুখে আসিয়া বাঙালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখ্যক আর্য ওপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ত্রুটি পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনামা রাজার পূর্বে কোন রাজার নামে নির্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তল্লানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুঞ্চপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে, কীচক নামে এক ম্লেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তারপর পালবংশীয়েরা রঙপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্বে রঙপুর কামরূপ হইতে কিয়ৎকালজন্য পৃথক রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয়, রঙপুরে পালবংশের প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বুর্বা বংশের আর আসিয়ার তৈমুরবংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্ষেত্রে দূরে, রাণী মীনাবতীর গড় ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজ্যায়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনৈ ছিলেন—বড় দুর্দান্তপ্রতাপ। গোপীচন্দ্র নামে তাঁহার পুত্র ছিল। মীনাবতী ধর্ম্মপালকে বলিলেন, “আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে?” ধর্ম্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী

সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজামাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য করিবেন। ইচ্ছা। পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার এক শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিল না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্মে মতি দিতে লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন।

গোপীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন? এই সেই হবচন্দ্র? নাম হবচন্দ্র নয়—ভবচন্দ্র, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে, টিপ্লে দিয়া নাক কাণ বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিন্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ্দ আপদ্দ পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কাণের পুঁটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ্দ উপস্থিত নগরে একটি শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে, রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্ত। বিপদ্দ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী টিপ্লে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে। আর একদিন দুই পথিক আসিয়া সায়াত্তে এক পুঁক্ষরিণী তীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান্ত পাত্র মহাশয়কে সিন্ধুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক কাণের টিপ্লে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে কাণ্ডানা দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, “নিশ্চিত ইহারা চোর! পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।” রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর

বুদ্ধিপ্রাপ্ত্যে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণেই পুকুরণীচোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি বিচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূর্বে পরামর্শ করিয়া হঠাতে পরম্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তখন একজন চোর নিবেদন করিল যে, “হে মহারাজ! দেখুন, এই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে, আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে সে পুনর্জন্মে চক্ৰবৰ্তী রাজা হইয়া সন্ধীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে মরিয়া সন্মাট হইতে চায়।” তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া বলিলে, “মহারাজ! ও কে যে, ও চক্ৰবৰ্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সন্মাট হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।” তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, “কি, এত বড় স্পন্দনা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্ৰবৰ্তী রাজা হইতে চাহিস! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরাবাবু!!” এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্মদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও। বরং মন্ত্রিবরকে আহ্বানপূর্বক সন্ধীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্ৰবৰ্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁহাদের মানবলীলা সমাপ্ত হইল।

এ ইতিহাস নহে—এ সত্যও নহে—এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, যে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙালার রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই

সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজড়া সচরাচর ঘোরতর গুরুত্ব হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। রাজারা হয় সেই বাঙালা কবিকুলরত্ন শ্রীহর্ষ দেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মনের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হ্বচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা বলিতেছি না; তাঁহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে, আমাদের এই নিরীহ জাতির শাসনকর্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়।

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঞ্জপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পর মেছ গারো কোছ লেপ্চা প্রভৃতি অনার্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তারপর আবার আর্যজাতীয় নৃতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিঞ্চিত্বন্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নির্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ৯॥ ক্রোশ, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২॥ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর; গড়ের ভিতর গড়—মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শত্রুশক্তাহীন আধুনিক বাঙালী খোলা সহরে বাস করে, বাঙালার সে কালের সহরসকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্বার সুবিস্তৃত হইয়াছিল দেখা যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্যন্ত রঞ্জপুর, আর মৎস্যের কিয়দংশ তাঁহার ছত্রাধীন ছিল। এই সময়ে বাঙালার স্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাঁহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ত্তু নির্মিত করেন, অদ্যাপি সে বর্ত্ত সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ত্তু। তিনি বহুতর দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুত্র নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর তাহাকে বধ

করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচীপুত্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুত্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুক্ষ হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠানরাজদিগকে বাঙালার রাজা বলিব না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই হউন—বাঙালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খড়কীদ্বার দিয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজ্য পর্যন্ত নীত হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল; সন্ধি চাহিল। সন্ধি হইল। ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, “মুসলমানের বিবিরা মহারাণীজিকে সেলাম করিতে যাইবে।” মহারাজ তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল, তাহারা রাজপুরমধ্যে পৌঁছিল। তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্যা বা কোন জাতীয় কন্যা বাহির হইল না—যাহারা বাহির হইল, তাহারা শুশ্রান্তিমুক্ষশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাত রাজপুরী আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে পিঞ্জরের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, অধিক দিন জীবিত ছিলেন না; কেন না, কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

এ দেশে রাজা গোলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধীন হইল। ইহার পূর্বে মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর আর্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রঙপুররাজ্য এই সময় পাঠানের করকবলিত হইল।

এই সময়ে—কিন্তু কোন্ সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখশূন্য যে ইতিহাস—সে পথশূন্য অরণ্যতুল্য—প্রবেশের উপায় নাই—এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙপুরের জয়কর্ত্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্যন্ত রাজ্য করেন। মুসলমানেরা রঙপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত

করিয়াছিলেন। কামরূপ কোচেরা অধিকৃত করিয়াছিল। তাহারা রঙ্গপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল।